এসো, হাত ধরো

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৫৭

শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়
সুচরিতাসু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

বন্দিধর্মস্য

পড়ুয়ার পাঠশালা (প্রকাশিতব্য)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

এসো, হাত ধরো

এসো, হাত ধরো, ওই দিকে
আমি নিয়ে যাব।
অন্য দিকে যাবে?
তাও হাত ধরো।
তুমি যখন যে-দিকে যাবে, বলব না, যাও। বলব, এসো।
হাত ছাড়বো না।

একই নদীতে কেউ দু-বার করে না স্নান,
কেউ
দু-বার করে না একই ভুল।
নদী বদলে যায়, নদী অভিজ্ঞতা, নিয়ত বহতা,
নিত্যবহমান অভিজ্ঞতা
মানুষকে সমস্ত শেখায়।
শেখায় শীতের বস্ত্র, বর্ষার মুকুট, আর
গ্রীষ্মের দুরূহ পরিধান।
শেখায় প্রথম ভাগ, নারীবন্দনার ভাষা, গায়ত্রীর
সমূহ চরণ।
কখনো যথার্থ পারিশ্রমিকে, কখনো
মূল্যের অধিক মূল্যে শিখে নিতে হয়।

তুমি একদিন শিখে নেবে।

ততদিন হাত ছাড়বো না।
তুমি যখন যেদিকে যাবে, বলব না, যাও। বলব, এসো।

মূল্যের অধিক মূল্যে তোমাকে জেনেছি, পরিত্রাণ।

মনে মনে

তুমি যত দূরে যাও, তত দূরে চলে যায় পথ।
মনে হয়, তিনদিকের সমূহ ট্র্যাফিক
দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন চক্ষের নিমেষে চিত্রবৎ,
খোলা বলতে একটিমাত্র দিক।

তুমি যত কাছে আসো, এ-পৃথিবী ছোট হয়ে আসে।
মনে হয়, অসংখ্য নিঃশ্বাস, চক্ষু, ধ্বনি,
যেন কোনো জাদুকরী মন্ত্রবলে উধাও বাতাসে
হঠাৎ, তখনই।

এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে মনে হয়, ভ্রম।
তুমি কি বস্তুত ছিলে কাছে?
সর্বদিকে ছড়ানো রাস্তা অবিকল, শৃঙ্খলা-নিয়ম—
অনুপূর্ব শ্লিষ্ট হয়ে আছে।

অমনস্ক হাত তুলে তবু কাকে বিদায় জানানো—
তুমি জানো, শুধু তুমি জানো।

দূর থেকে

কে কথা বলছে কার সঙ্গে
ইশারায়, ইঙ্গিতে, ভ্রূভঙ্গে,
দূর থেকে দেখেছি এই রঙ্গ
স্রোত মিশে যাচ্ছে কোন্ তরঙ্গে।

থেকেছি একলা এক কক্ষে
নিজেকে রেখেছি অলক্ষ্যে,
যাই নি কখনো ছেড়ে অক্ষ
কোনোদিন শত্রুতা ও সখ্যে।

কে গেছে কোথায়, কোন্ প্রান্তে,
শহরে, গঞ্জে বা সীমান্তে,
চিরকাল থেকেছি খুব শান্ত
চাই নি কখনো কিছু জানতে।

দূর থেকে মজেছি যত রঙ্গে,
দেখেছি, অগ্নির আসঙ্গে
পুড়ে গেলে সমস্ত বিভঙ্গ—
সেই আঁচ লেগেছে এই অঙ্গে।

কে কার জন্যে

জ্যোৎস্নার জাজিমে সবুজ ছায়া, না ঘাসের জাজিমে জ্যোৎস্না?
আমার প্রায়ই ভুল হয়ে যায় আজকাল
আমি বুঝতে পারি না
মধ্যরাতের চাঁদকে অর্ধেক আড়াল করে মেঘ, নাকি
মেঘ ঢেকে দিয়ে অর্ধেক চাঁদ উঠেছে আকাশে।
যতদূর দেখতে পাই, অর্জুন গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে
সারি সারি ঘুমন্ত বাড়ি
কোন্ জানলায় আলো জ্বলে উঠতেই
একটি ডাল সরিয়ে নিল তার ছায়া।

ছায়ার জন্যে আলো, না আলোর জন্যে ছায়া?
কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে যায় সব কিছু
আমি বুঝতে পারি না
স্পষ্টত
কে কার জন্যে এবং কতখানি।

মধ্য তিরিশে

ভিতরে-ভিতরে বড়ো রকমের কিছু
বদল চলেছে, টের পাই।
এ নয় খাট ও আলনা-ড্রেসিং টেবিল স্থানান্তর
এক কোণ থেকে অন্য কোণে।
নয় দেয়ালের রঙ কিংবা ছবির বদল, নয় বাহারী পরদার
নতুন নক্‌শা কিংবা জাপানী প্রথায়
অন্যতর ফুলের বিন্যাস।

সে-রকম কিছু নয়।
চৌখুপির ভিতরে চৌখুপি, বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত
বড়ো জোর মাত্রার বদল
ঘটায়, ঘটাতে পারে।
কিন্তু আমি
এখন পুরনো খোপ ছেড়ে
সহসা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। মধ্য তিরিশের
ভীষণ উন্মত্ত হাওয়া আমাকে সম্পূর্ণ বাস্তুহীন
করে রেখে গেছে। চারিদিকে
এখন দেয়াল বলতে কিছু নেই, এখন আমায়
প্রথম সোপান মানে শূন্যের শরীর থেকে
গড়ে নিতে হবে
নিজস্ব নতুন সংস্থান।

উট

তোমার সুস্থির চিত্র অবিকল ফুটেছে কাগজে।
তেমনই বিখ্যাত গ্রীবা, ধনুকের মতো বাঁকা পিঠ,
প্রসিদ্ধ উচ্চতা, ভঙ্গি। ভূগোলে কি যোগীন্দ্র সরকারে
যেমন সহস্রবার মুখ তুলে মরুর জাহাজ।

অক্লেশে তোমাকে ওরা তুলে নিল নিজস্ব খাঁচায়।
শাদা কাগজের বুকে পাঁচ জোড়া শিক্ষার্থী আঙুল
পাঁচটি আয়নার মতো ফোটালো নির্ভুল প্রতিচ্ছবি।
যেন তুমি ফিরে গেছ পুনর্বার উন্মুক্ত স্বদেশে।

চিড়িয়াখানার উট, ছবিতে তোমাকে যত চেনা
মনে হয়েছিল, তুমি আসলে কি তত অবিকল?
তেমনই বিখ্যাত গ্রীবা, ধনুকের মতো বাঁকা পিঠ,
উচ্চতা, বিভঙ্গ।
তবু, কোথায় কোথায় যেন তুমি
তুমি নও। মনে হল, শারীব-সংস্থানে যত আলো
তাব বেশী অন্ধকার যেন তুমি গোপন করেছ।

রক্ত

নখ থেকে ছিটকে পড়ল এক চিলতে রক্ত:
তাজা টলটলে পদ্মরাগমণি।
পদ্মরাগ না রক্তবীজ?
আমার সারা শরীর ভিত-পর্যন্ত কেঁপে উঠল যেন
হঠাৎ, তখনই।

আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম
রক্তের সেই বিন্দু থেকে জন্ম নিচ্ছে এক স্পষ্ট অবয়ব।
হুবহু সেই মুখ, সেই স্বর,
তর্জনী উঁচিয়ে সটান এগিয়ে আসছে আমার দিকে:
তুমি হন্তারক।

তুমি হন্তারক...তুমি হন্তারক...

চার দেয়ালে তরঙ্গমালার মতো আছড়ে পড়তে লাগল
সেই শব্দ
অযুত প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল
সেই শব্দ
কড়ি-বরগা-খিলেনের মর্মকোষে বিঁধে-যাওয়া
সেই শব্দ
সহস্রফলা ছুরির মতো এগিয়ে এল আমার দিকে
সেই শব্দ

আমূল গিলে ফেলল আমায়।

সে

আরও একজন ছিল,
স্পষ্টত তাকে
দেখা যাক বা না-যাক।

এ-ঘরে যখন তুমুল হাসাহাসি
তখন ও-ঘরে,
ও-ঘরে যখন বাতি নিবে যেত শেষ বারের মতো
তখন এ-ঘরে,
কিংবা দু-জনেই যখন বাইরে
কোনো বিকেলে বা সন্ধ্যায়
চুপিসারে সে পিছু নিত।

দু-জনেই তাকে দেখেছে নিশ্চিত,
কিন্তু কেউ কাউকে ভাঙে নি,
কারণ, ভাঙবার সাহস
তখন ছিল না।

অন্ধকারে মশারির খুঁট তুলে
মধ্যরাত্রে চোরের মতন
তন্ন তন্ন করে দেখত সে
ঘুমন্ত দুটি মুখ,
আর দোলনার উপরে লাল ফুলের মতো
টাঙিয়ে রেখে যেত দুঃস্বপ্ন।

এখন
সত্যি ফুল ফুটে উঠেছে দোলনার উপরে।
আর তাই
সে পালিয়েছে।

পরস্পর

পরস্পর বেড়ে-ওঠা ঋণে ছুঁয়ে থাকা পরস্পর,
আমাকে যে-তুমি আমি যে-তোমাকে...এ-ভাবে বছর
ঘুরে যায়, কাটে দীর্ঘ পরম্পরাময় রাত্রিদিন,
তোমাকে যে-আমি তুমি যে-আমাকে...বেড়ে ওঠে ঋণ।

তোমার ঘুমন্ত মুখ সারারাত স্বপ্নে জেগে থাকে,
তোমার সমস্ত স্বপ্নে ছুঁয়ে থাকো তুমিও আমাকে।
প্রতিটি বিগত রাত্রি আমাদের আগামী রাত্রির
অলক্ষ্য প্রস্তুতি, যেন স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন, স্থির।

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস, চোখে চোখ, অধরোষ্ঠে ওষ্ঠাধর,
শরীরে শরীর, কাঁপে বিদ্যুতের তরঙ্গে নখর,
স্তনমূলে তীক্ষ্ম দাঁত, তীব্র স্বেদ; শিরা-উপশিরা,
শোণিতপ্রবাহে বেজে ওঠে স্তব্ধ মৃত্যুর মন্দিরা।

এ-ভাবেই কেটে যায় পরম্পরাময় রাত্রিদিন,
আমাকে যে-তুমি আমি যে-তোমাকে...ক্রমে বাড়ে ঋণ।

এ কার মুখ

এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাই,
ঘর থেকে বাইরে পা বাড়াই
একটি মুখ।
একলা পথে হাঁটতে হাঁটতে
ভিড়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে,
এ কার মুখ?
হোক সকাল মেঘলা দিন
আকাশ থাক কুয়াশালীন,
একটি মুখ।
রৌদ্র হোক আগুন-আঁকা
চতুর্দিক শূন্য, খাঁ-খাঁ,
এ কার মুখ?
বিকেল যায়, যায় না; রাত
যখন নামে অকস্মাৎ,
একটি মুখ।
স্তব্ধ, পরিত্রাণহীন,
থেকে-থেকেই রাত্রিদিন,
এ কার মুখ?

তোমাকে মানায়

তুমি এত অহঙ্কারী কেন?
কিছুটা মিথ্যের মায়া বরং মানাত ওই মুখে,
চক্ষুর পল্লবে নম্র কাজল যেভাবে
ফোটায় প্রচ্ছায়,
নখের আরক্ত আভা হয়ে ওঠে চিক্কণ-রক্তিম
যেমন সহজে,
শিল্পের স্বচ্ছন্দ টানে জেগে ওঠে নিহিত শৃঙ্খলা,
গোপন অথচ অনায়াস সেই চতুরালি
মানায় তোমাকে।

মনে হয়, এ তোমার ভান,
এই সরলতা, এই সত্যসন্ধ তীব্র অহঙ্কার
সমস্ত সাজানো।
তুমিও নিশ্চিত জানো, সব সত্য উচ্চার্য ছিল না।
জানো যে, অপ্রসাধিত যে-সত্য প্রখর সূর্যালোক
তার দিকে যায় না তাকানো।
জানো না? জানো না?

তবে এত অহঙ্কার কেন?

তুমি তো গান্ধারী নও
আজীবন বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে রাখবে তোমার দু-চোখ!

মন ভালো নেই

মন ভালো নেই, কী করে এ-কথা বলি!
দু-পাশে চেনা ও অজানা মানুষ, মাঝখান দিয়ে
হেঁটে যাওয়া, কোনোদিকে
না তাকিয়ে, মুখ না তুলে; ব্যগ্র হাতছানি ভুলে থাকা।
আয়নার ধুলো, চুল রুখুরুখু, না-কামানো দাড়ি—
এ-বয়সে আর মানায় না ঠিক।
প্রিয় পোশাকের মধ্যে অতিথি শরীরটা
মুখ গোঁজ করে থাকে।

আজকাল প্রায়ই এ-রকম হয়।
ভুল করে ঢুকি ঘড়ির দোকানে,
যেখানে অনেক সময় হঠাৎ থেমে গেছে,
যারা কোনোমতে তবু
বাঁচিয়ে রেখেছে ধুকপুকটুকু,
তারাও নানান ওলটপালট সময় দেখায়
আড়ালে আমাকে।

মন ভালো নেই, মন ভালো নেই;
এ-ছাড়া অন্য কারণ ছিল না।

দুঃখী মানুষের গল্প

দুঃখী মানুষ চেয়ে আছে দুঃখী মানুষের দিকে,
মুখে কোনো বাক্য নেই, দু-জনেই দেখছে চেয়ে-চেয়ে,
এক ভিক্ষুকের দিকে অন্য ভিক্ষুকের চেয়ে থাকা—
মনে-মনে হিসেব মেলানো ছাড়া কিছু নয়।

হিসেব মেলানো কিংবা না-মেলানো হিসেবের টান
যা তাকে সমস্ত দিন পথে-ঘাটে-বাজারে-আপিসে করে তাড়া,
যা তাকে সমস্ত রাত ভয়ার্ত একলা করে রাখে,
ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো থেকে-থেকে শূন্যে দেয় লাফ।

বন্ধুর উদ্যত হাত থেমে থাকে, গার্হস্থ্য প্রণয়
পাংশু দেয়ালের মতো ধরে রাখে ইতস্তত ছায়া,
অন্ধকারে নতমুখ প্রেমিকা রুমালে ঢাকে চোখ,—
সে কিছু বলার আগে ভেঙে যায় যাবতীয় দৃশ্যের সুন্দর।

দুঃখী মানুষ তাই চেয়ে চেয়ে চেয়ে থাকে
অন্য দুঃখী মানুষের দিকে,
ঘুমে-স্বপ্নে-জাগরণে এই ভয়ংকর চেয়ে থাকা
অন্য এক ভিক্ষুকের দিকে।

খোলস

খোলসের মতো পিছনে পড়ে থাকে পুরনো জামা,
নতুন খোলসও পুরনো হয়ে আসে একদিন,
খোলস
ছাড়তে ছাড়তে বয়স,
বয়স
বাড়তে বাড়তে খোলস,
তুমি এগিয়ে যাচ্ছ সটান
বীজের পোশাক ছাপিয়ে যেমন অঙ্কুর।

হাওয়া এবং রোদ্দুর
তোমাকে উপহার দেয় নতুন পোশাক
প্রতিদিন।
দেয় উন্মেষের মন্ত্র, নির্ভরতার শস্ত্র, আত্মরক্ষার বর্ম,
তিল তিল জীবন;
অর্থাৎ নতুন-নতুন খোলস জীবনভোর।

মনে রেখো

যে-দিকেই যাও, উত্তরে যেয়ো না।
এখন তুমি অনন্যনির্ভর
সদ্য-শেখা পদক্ষেপে চিনে নিচ্ছ নতুন পৃথিবীকে।
ঘর পেরিয়ে বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে মস্ত উঠোন,
উঠোন পেরিয়ে সারা বিশ্বচরাচর
অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্যে।
এখনও তোমার পায়ে রুপোলি পাহারা
বেজে উঠছে ভুল ছন্দে :
টলটলে পায়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ
এ-ঘর থেকে ও-ঘর, বারান্দা থেকে উঠোনে।

উঠোন পেরিয়ে তারপর?
যখন চারদেয়াল বলতে বিশ্বচরাচরে চতুর্দিক,
নিজেই যখন তুমি খুলে ফেলবে সমস্ত নিষেধ?
শুধু মনে রেখো,
আর যেদিকেই যাও, উত্তরে যেয়ো না কোনোদিন।
মনে রেখো,
তিন দিকে জীবন,
অন্য দিকে ওত পেতে বসে আছে সর্বনাশ,
অন্ধকার, নিষিদ্ধ, গোপন।

বর্ণপরিচয়

আমার সমস্ত বর্ণমালা আমি তোমাকে দিলাম,
তুমি অন্যভাবে শুরু করো।
ইচ্ছে হয় রাখো, নইলে ছুঁড়ে ফেলে দাও একটানে,
দুমড়ে, মুচড়ে, ভেঙেচুরে
নিতান্ত তোমার করে নাও।

প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে মিশে ছিল
আমার নিজস্ব বোঝাপড়া,
আনন্দ এবং দীর্ঘশ্বাস।
একান্ত গোপন কিছু অভিজ্ঞতা, অহঙ্কার, স্মৃতি,
অভিমান-পরাজয়
কিছু-কিছু।
কিছু ব্যর্থতার গ্লানি আর কিছু সফল প্রণয়।

তুমি নিজস্ব পছন্দে তাকে রাখো কিংবা ছুঁড়ে ফেলে দাও,
যাই করো,
রেয়াত করো না।

যেন স্মৃতি, যেন স্মৃতি নয়

এই খিলানটা, ওই দেয়ালটা,
ঘোরানো সিঁড়িটা, টানা বারান্দা,
গির্জার পাশে গাছের ডালটা,
চৌকো আয়না—স্তব্ধ, ঠাণ্ডা,
পায়রার ওড়াউড়ি কার্নিসে—
যা-কিছু দৃশ্য এই চারিভিতে,
গোপনে রক্তে ছিল যেন মিশে
গত জন্মের বাতাসে, স্মৃতিতে।

চলতে-ফিরতে ঘর থেকে ঘরে
সরে যায় ছায়া, হেঁটে যায় কারা,
ফিরে আসে সোজা বুকের ভিতরে
ভেঙে ফেলে দিন-রাতের পাহারা।
জানি না। তবুও যেন মনে হয়,
থাকে, সব থাকে; কিছু হারায় না।
কিছু তার জানে ধূর্ত সময়,
আর জানে ওই চৌকো আয়না।

হঠাৎ হাওয়া

মানুষ থাকে না, শুধু
পড়ে থাকে দিনানুদৈনিক
অভ্যস্ত শৃঙ্খলা; ক্রমে
স্পষ্ট হয় হাঁ-মুখ গহ্বর;
টুকরো মুহূর্তের খণ্ড
রেখাচিত্র ক্রমশ অলীক
হয়ে ওঠে; ব্যবধান
ভরে তোলে স্তব্ধ অবসর।

মানুষ থাকে না। থাকে
পদচ্ছাপ, আলতা বা চন্দন,
শূন্য দেয়ালের কোলে
একদা-উজ্জ্বল প্রতিকৃতি।
বৎসরান্তে তাজা ফুল,
গন্ধধূপ, মাল্যের বন্ধন
আর-যা, হঠাৎ হাওয়া:
মন-কেমন-করে-ওঠা স্মৃতি।

অপ্রাকৃত

ছিলাম দক্ষিণে, কেন্দ্রে; এবার উত্তরে।
অতঃপর
'কোন্ দিকে ? কোন্ দিকে ?' বলে চমকে দিল মাথার উপরে
প্যাঁচার কর্কশ কণ্ঠস্বর।

কোন্ দিকে ? কোন্ দিকে ? আমি চতুর্দিকে চকিতে তাকাই
কার্তিকের মধ্যরজনীতে
হিম-কুয়াশার জাল, বাতাসের তীব্র সাঁইসাঁই,
অদ্ভুত স্তব্ধতা চারিভিতে।

যেন চারটি ছায়ামূর্তি—বায়ু-অগ্নি-নৈঋর্ত-ঈশান
চলে গেল বাজিয়ে খঞ্জনি,
নক্ষত্রের খই ছিটিয়ে, রাত্রির নৈঃশব্দ্য খান খান
করে জাগল তীক্ষ্ন হরিধ্বনি।

উত্তরাধিকার

তোমার যখন একত্রিশ, তখন আমি; এখন আমারই একত্রিশ,
দাঁড়িয়েছি আজ তোমার সামনে এসে স্পষ্ট মুখোমুখি,
তুমি বাবাটি, দেয়ালের তৈলচিত্রে পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, সুখী,
ঈষৎ হাসির রেখা অধরে স্ফুরিত, নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছ অহর্নিশ।

চোখে, চিবুকে, চুলে, ভ্রূভঙ্গিতে বহুচেনা মুখের আদল,
অনেক টুকরো মুহূর্তে যেমন অ্যালবামের হলুদ স্মৃতিতে,
একত্রিশ বছর আগে তোমার নিজস্ব পৃথিবীতে
যেন তুমি আরেকবার দাঁড়িয়ে রয়েছ অবিকল।

আজ আমি দাঁড়িয়েছি তোমার সামনে এসে স্পষ্ট, দেখ তুমি.
দু-আঙুল ব্যবধান তোমার আমার মধ্যে, তবু এক অচেনা গহ্বর
উত্তরাধিকার ভেঙে কেবলই সরিয়ে দিচ্ছে দূর থেকে দূরে, ধসে যাচ্ছে ঘর,
ম্লান থেকে ক্রমে ম্লানতর তোমার উজ্জ্বল পটভূমি।

প্রথাসিদ্ধ

আমি তোমাকে ভাঙতে চেয়েছিলাম, তুমি মুদ্রা স্থির রেখে
শরীরটাকে ইচ্ছেমতো বাঁকাও, পেশীর ঢেউগুলি অক্ষত
থাকুক, স্রোতের মতো গতি, পাখির পায়ের লঘু চলার মতো,
যেমন সহজ নিঃশ্বাসে প্রত্যেকে
বাতাস ভাঙে, যেমন জলের অনেক নীচে মাছের ডানা-মেলা
ফুলের ফুটে-ওঠা যেমন সরল এক খেলা...
আমি তোমাকে ভাঙতে চেয়েছিলাম।

আমি চেয়েছিলাম, যেমন আমায় ভাঙো, কেবল ভাঙো তুমি.
বুকের মধ্যে ঝড়ো হাওয়া হঠাৎ যখন শিকড়ে দেয় টান,
অলক্ষ্যে জল জমে ওঠে, স্তব্ধজোয়ার যখন বিরল বেলা,
পুরনো সেই খেলায়
বিষম জোরে বাজাও হঠাৎ তীব্র নেশার অদৃশ্য ঝুমঝুমি
শূন্য প্রহর ছড়িয়ে যায়, কাচের বাসন মুহূর্তে খান খান—

আমি তোমাকে ভাঙতে চেয়েছিলাম।

হানা

জীবন যতটা দেয়, ততটাই ঠিক বুঝে নেয়।
তবু যেন
জীবনের কাছে কিছু থেকে যায় ঋণ,
থাকে বাকি,
তাই সে অমন করে অতর্কিতে হানা দেয়
মধ্যরাতে, কোনো একদিন,
হঠাৎ, একাকী।

ঘুমের ভিতরে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি বারবার,
ঘুম ভেঙে গেছে।
এ-রকম যায়।
মধ্যরাতে চতুর্দিক গভীর গভীর অন্ধকার,
মনে হয়, কে যেন এসেছে।
মনে হয়, সে এসে দাঁড়ায়।

কখনো জীবন তার প্রাপ্য বুঝে নেয় হাতেনাতে।
তবু যেন
জীবনের কাছে কিছু থেকে যায় ঋণ,
থাকে বাকি,
তাই সে অমন করে অতর্কিতে আসে মধ্যরাতে
কোনো একদিন,
হঠাৎ, একাকী।

মুখোশ

স্থির চোখে চেয়ে আছ, সামান্য বিকার নেই মুখে।
অন্যভাবে বলতে গেলে, সেটুকুই সুস্থির বিকৃতি
শিল্পীর উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে ছিল যার আবছা প্রতিকৃতি;
ঈষৎ ক্রোধের ভাষ্য কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠে ও চিবুকে।
ক্রোধ কিংবা প্রতিহিংসা। মুহূর্তের নির্দিষ্ট রেখায়
অনন্ত সময় বন্দী। ওই ওষ্ঠ, স্থির চক্ষু দুটি—
যা দেখে একলা-ঘরে কেঁদে ওঠে নিতান্ত শিশুটি—
জানে না মায়াবী ভাষা, যা গোপন আড়াল শেখায়।

অথচ আমাকে দ্যাখো। যে-আমি প্রতিটি অনুপলে
মুছে ফেলি ব্যবধান অদৃশ্য তুলির দক্ষ টানে,
যে-আমি ভিক্ষার ঝুলি ভরে নিই ঘৃণা-অপমানে,
যে-আমি গোপনে একা দগ্ধ হই নিজস্ব অনলে,
যে-আমি উচ্ছল, সুখী, সহাস্য, বৎসল, বন্ধু, স্বামী—
অসংখ্য মুখোশে ঢাকা সেই আমি, সেই একই আমি।

ছুটি

পিছনে রইল বিবর্ণ ঘাস
কাছের খন্দ, দূরের আকাশ,
তিন লাফে তুই পার হয়ে যাস
উড়ন্ত অপ্সরা,

হোক না, অল্প, ধূল-পরিমাণ,
তবু ঠিক পাবি শব্দের ঘ্রাণ,
সামনে-পিছনে সজাগ সমান
দর্পণ একজোড়া।

পশমিনা ? নাকি নমনীয় তার ?
স্প্রিংয়ের শরীরে হরেক বাহার।
শাদা মলমলে ফোটে নকশার
বাদামী-হলুদ ডোরা।

একটু আদরে বাড়াস গালটা
গড়াগড়ি যাস উলটোপালটা,
তোকে দেখে কাটে এই সকালটা
ছুটির সুতোয় মোড়া।

বিষম ছন্দে

ছুটি চাইতে গিয়ে হাত কেঁপে যায়।
কার ছুটি? কে দিতে মালিক?
তাড়াতাড়ি বাইরে আসি, বারান্দায়
উড়ে গেল একজোড়া শালিখ।

পড়ন্ত রোদ্দুর লেগে গাছটাতে,
বেলা এখনো ফুরোয় নি। ভালো।
শুধু দূরের ঝিলটার কাছটাতে
অল্প-একটু মেঘ জমেছে কালো।

কাগজটাকে দুমড়ে-মুচড়ে গোল করে
জানলা দিয়ে সটান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে,
'বেলা যায় নি, বেলা যায় নি, যায় নি হে'-
নিজেকেই শোনাই বেশ জোরে-জোরে।

ওরা

মেলাতে পারি না, ওরা দ্রুত পালটে নিয়েছে ওদের
কণ্ঠস্বর, চোখের ইশারা,
চলার নিজস্ব ভঙ্গি, কিংবা বলা ভালো, নিজেদের;
কৌতুক, উচ্ছ্বাস, মন্ত্রগুপ্তি; গুপ্ত মন্ত্রের মতন
শব্দের আচার। গড়ে নিয়েছে ওদের
একান্ত গোপন দুর্গ।

চক্ষুর সম্মুখে ওরা হেঁটে যায় প্রতিদিন
চক্ষুর আড়ালে চলে যায়।
বস্তুত দূরত্ব আরও বেড়ে ওঠে, যোগাযোগহীন
প্রতি মুহূর্তের শূন্যতায়।

ওরা কত দূরে যায়? ওরা কত দূরে যেতে পারে?
ভয় করে। ভয় না বয়স?
অজান্তে কখন যেন মাটির গভীরে নেমে গেছে
কঠিন শিকড়।

মায়া লাগে

মায়া লাগে।

পথ বেশী নয়। প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি নারী-শরীরের মতো অভ্যস্ত, আয়ত্ত। বিষম চেনা। দেখতে-দেখতে পার হয়ে যাই। জানি, কোন্‌খানে বাঁক, কোথায় অসমতল, কখন হঠাৎ ওঠা-নামা। কোথায় আলোর রাজ্য, কোথায় অন্ধকারের নিষেধ, সমস্তই জানা ছিল। তবু কেমন ঘোর লেগে যায়। মায়া লাগে। পথ মিশে যায় পথের মধ্যে, পথ খুলে যায়, পথ যায়

মায়া লাগে, মায়া লাগে।

বৃষ্টিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া হঠাৎ শরীর জড়িয়ে ধরে। পথ সরে যায়। শরীরে নুন, আঁটো পোশাক, ক্লান্ত খোলস হারিয়ে যায় এক নিমেষে। অনেক দূরে ঘাসের ওপর আলোর বিন্দু, জলের মায়া। পিছনে মাঠ অন্ধকারে বিশাল নদী। থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকে জলের ছোট-বড় বৃত্ত. অল্প দূরের বাঁকে-বাঁকে, অসমতল পথের চূড়োয়। ধুলোর পারদ পিছন দিকে, চিকচিকিয়ে ওঠে আয়না।

রহস্যময় মেঘের পুঞ্জ আলোর গুণ্ঠন, স্তব্ধ শীতল দিগন্ত, গ্যাসের আলো, হলুদ বাড়ি, ভিজে মাটির নরম গন্ধ—।

মাটি না ধরিত্রী? মাটি না ধরিত্রী?

মায়া লাগে।

পরাভব

বস্তুত বাইরের ধাক্কা নয়,
ভিতরে-ভিতরে ক্রূর প্রতিরোধ
গড়ে উঠছিল।
তুমি যাকে সমর্পণ ভেবেছিলে, আসলে তা বানানো প্রণয়,
প্রতিবাদ—গোপন আক্রোশ, ঘৃণা, ক্রোধ
আড়ালে ফুটছিল।

প্রথম সুযোগে তাই দশদিক অন্ধকার করে
মেঘ-নামার মতো
নেমে এল তারা,
মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সমস্ত পাহারা,
নিমেষেই পলাতক রক্ষী-বাহিনীরা ইতস্তত।
মেঘ না চাইতে জল অন্ধকার পর্বতশিখরে।

দশদিকে দুরন্ত ভ্রূকুটি।
অনন্যগতির মতো নতজানু,
স্তব্ধ হাত দুটি
ঊর্ধ্বে তুলে ধরে
বসে থাকো স্থাণু,
আঁকাবাঁকা উদ্‌ভ্রান্ত অক্ষরে
সন্ধিপত্র লিখে দাও, ভিক্ষা চাও অবসর, ছুটি।

কিছুই হল না

এই ভোরবেলা
শব্দের সমূহ যুক্তি ভেঙে যায়, ভেঙে-ভেঙে যায়,
কী যেন হবার ছিল, হল না কিছুই,
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকাররব
হঠাৎ ছড়িয়ে গেল
দিগন্তরেখায়।

বর্ষায় মলিন দিন। বৃষ্টি? নাকি অশ্রুবারিধারা?
আকুল বাতাসে
রাজ-রাজেশ্বরী কণ্ঠ ভাসে।
কিছুই হল না, কেন, কিছুই তো হল না, কিছুই—

চারদিক আঁধার করে মেঘ জমে, ঝাপসা গাছপালা
শিকড় নামিয়ে দেয় বুকের ভিতরে।
শব্দের সমূহ যুক্তি ভেঙে পড়ে, ভেঙে-ভেঙে পড়ে।

আট বছর পরে একদিন

এখানে ঝুল, ওখানে কালি, নিত্য কিছু ধুলো
জমছে বইগুলোয়,
পলেস্তারা-খসা দেয়ালে টাঙানো ছবিটার
মতন এই সাজানো সংসার।
আটটি শীত-গ্রীষ্ম আর বর্ষা পার হয়ে
কিছুটা গেছে ক্ষয়ে,
তবু যা আছে বাকী—
সেটুকু ভগ্নাংশ নিয়ে এখনো বেঁচে থাকি।

অনেক পাতা ঝরেছে গাছে, নেমেছে ঢের ঝুরি,
নতুন করে ধরেছে ফের কুঁড়ি।
উনত্রিশ শো বাইশ দিনের পুরনো সংসারে
অনেক রিফুকর্ম, কলি ফেরানো চারিধারে
রয়েছে জানি বাকী,

ফিকে স্মৃতির ছবির টানে তবুও বেঁচে থাকি।

পড়ন্ত রোদ্দুরে

কী ছিল, কতটা ছিল, স্পষ্ট করে বোঝা না-গেলেও
দূর থেকে মনে হয়েছিল,
সরে গেলে সামান্য আড়াল—
চেনা যাবে।

জানি না, কতটা মায়া লেগে ছিল পড়ন্ত রোদ্দুরে,
শুধু জানি, করবীর ডাল
লোহার জাফরি-কাটা দরোজার কাঁধের উপর
মাথা রেখে প্রগাঢ় সোহাগে
ঝুঁকে পড়েছিল।
মেঘ এসেছিল নেমে
হলুদ বাড়ির চিলেছাদে আর সটান কার্নিশে।

দু-এক মুহূর্তমাত্র।
চারজোড়া কৌতূহলী চোখ
আবার ভ্রূক্ষেপহীন নিসর্গদৃশ্যের মতো
ছিটকে গেল সমতল খোপে।

কৌতূহল ভেঙে গেলে যেভাবে মানুষ ফিরে যায়।

অলীক

দুই দরোজার মাঝখানে এই পুরনো ঘর।
তার মানে কি জন্ম-মৃত্যু? তার মানে কি
মুঠোর মধ্যে ধরে-রাখা অলীক প্রহর?

হাওয়া এসে শুনিয়ে যায় অচেনা স্বর।
চমকে উঠে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি
বিশাল কালো স্তব্ধ আকাশ মাথার উপর।

কেউ কি থাকে? কেউ কি ছিল? কেউ কি আছে?
এক মুহূর্তে সমস্ত রঙ ঘোর অচেনা।
শূন্য, শুধুই শূন্য এখন দূরে-কাছে।

দুই দরোজার মাঝখানে আজ শূন্য নাচে।
বুকের মধ্যে লুকনো এক হাসনুহেনা
যায় পুড়ে যায় সেই আগুনের কঠিন আঁচে।

সার্কাস

বুকের মধ্যে সবই আছে,
পোষা কাকাতুয়া, বাঘ কিংবা ময়ূর।
হঠাৎ যখন নিজের গলায়
শুনতে পাই অবিকল অন্য কারো গলা—বুঝি, খেলা
শুরু হল কাকাতুয়ার।
কিংবা যখন অনির্দেশ্য চাবুকের আওয়াজে
শিক্ষিত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে উঠি ভয়ে—
বুঝতে পারি, খেলা
শুরু হল বাঘের।

আকাশে রোদ্দুর থাক বা মেঘ,
সময় হোক শরৎ কিংবা বসন্ত,
ইচ্ছেহীন মনের মধ্যে তখনও পেখম মেলে দিলে ময়ূর
বুঝতে পারি, দর্শকের ইচ্ছেয় এখন খেলা
শুরু হল সার্কাসের।

বুকের মধ্যে সবই আছে,
পোষা কাকাতুয়া, বাঘ কিংবা ময়ূর।
তবু হঠাৎ এই সন্ধেয় কোত্থেকে
দর্শকহীন বুকের ছাউনি সরিয়ে
বেরিয়ে এল ছেঁড়া-পোশাক এক ক্লান্ত বিদূষক,
তাকিয়ে দেখি, তার চোখে
টলটল করছে দু-ফোঁটা জল।
কেউ হাততালি দিল না, দেবে না—
তবু।

পাণ্ডুলিপি

শব্দ কেটে-কেটে নকশা, আর
নকশা মুছে ফের খোঁজা,
কোথায় রয়ে গেছে এই খেলার
আড়ালে বন্ধ দরোজা।

খোলে না খিল তার, দুই কপাট
শুধু নতুন করে ঢাকে
দৃশ্যময় চেনা রাজ্যপাট
অন্ধকার কিংখাবে।

শব্দ কেটে-কেটে নকশা-মাছ
বৃক্ষ-পাতা-আলপনা,
যেন কাঁথার বুকে সুচের কাজ
সূক্ষ্ম ফোঁড় তুলে বোনা।

কেবলই নকশায় ভরেছে ঘর,
খোলে নি তবু সেই খিল;
অন্তহীন পথ ভয়ংকর
রক্তপাতে পিচ্ছিল।

অন্য পটভূমি

জানতেই পারি নি, এরা
এমনভাবে একলা ফেলে যাবে,
সকালবেলার রৌদ্রে-ফেরা
শালিক-চড়ুই, বৃক্ষ ও ফুল-লতা,
সজ্জিত মেঘ, দূরের দৃশ্য—
সন্ধেবেলা হারাবে এইভাবে,
বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে নিঃস্ব
অনুভবের বিষণ্ণ রূপকথা।

জানতেও পারি নি, ওরা
এমনভাবে একলা ফেলে যাবে,
কুলায়-ফেরা বিহঙ্গরা,
ছায়ার চূড়ায় আলোর রঙ, আর
সারি-সারি ছবির মতো
দৃশ্যগুলি হারাবে এইভাবে,
জ্বালিয়ে দিয়ে ক্রমাগত
বুকের মধ্যে দ্বিগুণ অন্ধকার।

জানতেও পারি নি, দৃশ্য
হারিয়ে গেলে একলা অন্ধকারে
রাত্রি এমন বিপুল বিশ্ব
ফিরিয়ে দেবে। চোখের সামনে ফিকে,
আবছা আলোর স্তব্ধ বিন্দু
এমন করে জাগিয়ে তুলতে পারে
দশদিগন্ত সপ্তসিন্ধু—
অন্য পটভূমির ছবিটিকে।

গ্রহণ

এই আমি, দ্যাখো, আমার চোখের আবিল মণিতে
তিরিশ শ্রাবণ রেখে গেছে মেঘ বিদ্যুৎ ঝড়,
দ্যাখো শোক, গালে ক্ষতের চিহ্ন, দ্যাখো ধমনীতে
শোধিত রক্তে অপ্রেম, লাঞ্ছনায় পাথর

বুকের বাঁ দিকে ঘৃণার গর্ত, লোভের আঁচিল,
দুরাকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ নখর, চিবুকে আহত
প্রতিশোধ, চুলে রুক্ষতা, হিংসার কালো তিল,
সারা দেহে ঝরে পড়ে বিতৃষ্ণা শ্লেষ্মার মতো।

এই আমি, দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, গত তিরিশ বছরে,
তবু হাত ধরে নিয়ে যেতে চাও গ্রহণের ঘরে!

পরবাস

বড়ো দীর্ঘদিন আমি এমন প্রবাসী হয়ে আছি।
বড়ো দীর্ঘদিন দীর্ঘবেলা।
জলের ভিতরে ক্রমে জমে ওঠে শ্যাওলার সবুজ,
হাওয়া ভারী হয়ে আসে, স্রোত
থেমে যায়, ক্রমে
কুসুমের বুক থেকে ঝরে পড়ে নিহিত কুসুম।
দীর্ঘদিন বিজনে, একেলা।

বিদায়, এবার আমি অচেনা বিন্দুতে ফিরে যাব।
জলের ভিতরে
অচেনা ঘূর্ণির টান, হাওয়ার দাপট,
স্রোতের শ্বাপদ-দাঁতে ছিঁড়ে যায় ভেলা,
জ্যোৎস্নায় দাউদাউ শব্দে ফুটে ওঠে ঘুমন্ত উদ্যান!
বিদায়, রক্তের মধ্যে বেজে ওঠে অস্থির স্বদেশ
দীর্ঘকাল পরে।

হাততালির পরে

হাততালি ফুরোবে, ফুরোয় ;
কেউ-কেউ ততদিনে বুড়ি ছোঁয়।
পারে না যারা তা
ক্রমশ কুঁচকে আসে পাঞ্জাবির হাতা,
ভাঁজ ভেঙে যায়,
শরীরের টান টান চামড়ায়
রেখা পড়ে।

কেউ ঘৃণাক্ষরে
সর্বনাশ বুঝতে পারে,
যারা তা পারে না—
অন্ধকারে
একমাত্র চেনা
পথটাকে বারবার নতুন
বলে ভুল করে, শরীরের
সবটুকু নুন
ফুরিয়ে হঠাৎ দেখে—এর
থেকে মুক্তি নেই, শুধু দেরি
বড়ো দেরি হয়ে যায়, একমুহূর্তেরই
মস্ত এই ভুলে

ফুরোবে, ফুরোয় ; কিন্তু হাততালি ফুরুলে

সপ্তপদী

সাতবার ওই পবিত্র অগ্নিকে
প্রদক্ষিণের ছলে
সাতটি করুণ বৃত্তের রেখা এঁকেছ চতুর্দিকে,
পুরনো যা-কিছু সম্বল ছিল বেঁধে-রাখা অঞ্চলে
হারালো, আজ এই সতেরই অঘ্রানে;
এখন কোথায় পা রাখি, গণ্ডি সবদিকে, সবখানে।

বড়ো লোভ ছিল, চন্দনচর্চিত
মুখচ্ছবিটি একবার দেখি যদি,
অথচ অগ্নি সাতবার তুমি প্রদক্ষিণের ছলে
যা-কিছু অতীত অর্থাৎ বাসী, মৃত
পোড়ালে শুদ্ধ পবিত্র হোমানলে।

এখন কোথায় পা রাখি, জ্যোৎস্না পোড়ায় সপ্তপদী।

এক মুহূর্ত

প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল কয়েক লক্ষ মাইল, তোমার কথা,
একটি গোপন উচ্চারণের ভাষা—
এক মুহূর্তে অনন্তকাল, মৃত্যুর স্থির ছিন্নধনু-ছিলায়
বাঁধা পড়ল, এক জন্মান্তরের পুণ্য স্মৃতি
নিঃশ্বাসের শব্দে-ছেঁড়া কুয়াশায় দশদিকে
ব্যাপ্ত হল, দুলে উঠল রাত্রির গাছপালা
আকাশের নক্ষত্র, মেঘ, গোলাপবনে দশবিন্দু স্ফটিক।

অলৌকিক ট্র্যামের ঘণ্টা দিগন্তের বৃত্তরেখায় মেশে,
নিয়নের জ্বলন্ত আলোয় মুখ দেখে নেয় রূপসী কলকাতা,
নিয়নের নিবন্ত আলোয় মুখ ঢেকে দেয় রূপসী কলকাতা,
একটি কথার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায় কয়েক লক্ষ মাইল
বাতাস, আলোর তীব্রগতি, ট্র্যাফিকের লাল চক্ষুর পাহারা
সময়, জন্ম, জন্মান্তর, জাগরণ, বিস্মৃতি।

গোলাপবনের দশবিন্দু স্ফটিকে
এক মুহূর্তে অনন্তকাল, মৃত্যুর স্থির ধনুক-ছেঁড়া ছিলায়।

কাকবন্ধ্যা

ফুলন্ত বৃক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছ কাকবন্ধ্যা নারী,
ওষ্ঠের ধনুকে ক্রূর অহঙ্কার স্পষ্ট দেখা যায়।
সংহত করেছ আত্মবঞ্চনার শূন্যতাকে, তারই
ক্ষমাহীন ছায়া পড়ে আত্মা জুড়ে, শোণিতে, মজ্জায়।

সন্নত সন্ধ্যায় তুমি দাঁড়িয়েছ, উদাস ডুবুরী
স্মৃতির পাতালে নামে, স্মৃতি আজ পাতালবাহিনী,
নক্ষত্রের মতো অশ্রু রাত্রির আকাশে ফুলঝুরি,
স্ফুলিঙ্গের অগ্নিকণা জ্বালাবে দুচোখে নিশীথিনী।

ফুলন্ত বৃক্ষের পাশে দাঁড়িয়ো না, কাকবন্ধ্যা নারী,
বৃক্ষপতনের শব্দ সারারাত স্বপ্নের ভিতরে,
সারারাত স্বস্তিহীন আর্তনাদ, বনে বনান্তরে
যেন জ্বলে দাবানল, রক্তাক্ত আত্মার মতো স্থির
কার প্রতিচ্ছবি হয়ে কেঁপে ওঠে বৃক্ষের শরীর।
স্মৃতির কুঠার ক্রমে আত্মঘাতী তীক্ষ্ণ তরবারি।

রক্তের ভিতরে

বুকের ভিতরে ছিলে, রক্তের ভিতরে, দোলাচল
স্তব্ধ করে জেগে-ওঠা তীব্র দ্যুতিময় অভিজ্ঞতা,
লক্ষ শিরা-উপশিরা, প্রবাহ, স্পন্দন; অবিরল
নিঃশ্বাসের শব্দে-ভাঙা সময়ের শীতল স্তব্ধতা
রক্তের ভিতরে স্রোত, বুকের ভিতরে পথ; চলে
অবিচ্ছিন্ন ধ্বংস ও নির্মাণ। তুমি ছিলে, তুমি থাকো,
গোলাপবাগানে সূর্য শেষবার রক্তাক্ত অতলে
ডুবে গেলে, জেগে-ওঠা মুহূর্তের উন্মোচিত সাঁকো।

অথচ স্পষ্টতা এক পুরনো ঘড়ির ব্যবহৃত
হৃৎপিণ্ড, মরচে-পড়া সময়, স্পন্দনস্তব্ধ গতি,
তুমি শব্দ নও, তুমি ভাষা নও, জীর্ণ, বাসী, মৃত
ছন্দ কিংবা মিল নও; মুহূর্তের বিরল স্থপতি—
তীব্রদ্যুতি অভিজ্ঞতা, ধ্বনিময় অদৃশ্য নিখিলে
বুকের ভিতরে, তবু, রক্তের ভিতরে, তুমি ছিলে।

এখন আমার

এখন আমার বুকের মধ্যে তিনটে বিষম গভীর গর্ত
এখন আমি তোমার কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে!
এখন আমার প্রশ্নবিহীন সমস্ত রাত সমস্ত দিন
তীব্র দ্বিধায় ছিন্নভিন্ন, লুপ্ত শরীর হাওয়ায় ওড়ে।
লোভের পাপের ঘৃণার কঠিন তীক্ষ্ণতম এই আবর্ত।

এই যে চেনা শহর আমার অনেক দিনের চেনা শহর
প্রতি পথের বাঁকে নতুন আলোর দীপ্ত সমারোহ
হারিয়ে গেল এক নিমেষে, এখন ধু-ধু নিরুদ্দেশে
অন্ধকারে হাতড়ে ফিরি হারানো সেই স্বপ্নমোহ।
এখন চতুর্দিকে প্রবল লোভের পাপের ঘৃণার প্রহর।

হারিয়ে গেছে ভালোবাসার অন্যতম প্রধান শর্ত।
আর্ত কণ্ঠে চমকে উঠি : এমন আমি চাই নি চাই নি,
ভাবনা জুড়ে অবিশ্বাসী লক্ষ প্রেতের অট্টহাসি
স্বপ্নে এবং জাগরণে তিনটি কুটিল হিংস্র ডাইনী,
লোভের পাপের ঘৃণার কঠিন তীক্ষ্ণতম এই আবর্ত।

এখন আমি তোমার কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে।

অপেক্ষা

অপেক্ষায় থাকা সারাক্ষণ.
যদি বজ্রপাত হয় ফুলের বাগানে, যদি নদী
ঢেউয়ের ছোবল তুলে ধরে,
প্রচণ্ড ঝনঝন শব্দে কাচের শার্সিটা ভাঙে যদি.
টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে,
আর্তনাদ করে ওঠে অমল নিসর্গ. উপবন।

কিছুই ঘটে না. বহুদিন:
আশ্চর্য কোথাও নেই. কোনোদিন ছিল না. কেবল
হেমন্তের জরতী সন্ধ্যায়
কুয়াশার মতো স্থির বিষণ্ণ আর্তির স্তব্ধতায়
মগ্ন হওয়া. রক্তের কঠিন
শীতল স্রোতের শব্দ চিন্তার প্রবাহে অবিরল।

অপেক্ষা. অপেক্ষা. সারাক্ষণ......
যদি বজ্রপাত হয় ফুলের বাগানে. যদি নদী
লক্ষবাহু ঢেউয়ের ফণায়
হিংস্র আক্রোশের বিষ ঢেলে দেয়, বন-উপবন
অমল নিসর্গ পুড়ে যায় তীব্র আর্তনাদ করে!
বহুদিন কিছুই ঘটে নি। চিন্তা-রক্তের ভিতরে
অদ্ভুত স্তব্ধতা ছিঁড়ে এইবার উন্মাদ হাওয়ায়
শব্দ করে ভেঙে যাবে সব কিছু. যদি ভাঙে...যদি.

অদৃশ্য দর্পণ

হে অমল ধ্বনিপুঞ্জ, হে বিপুল গাঢ় অন্ধকার,
অদৃশ্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত হে বিষণ্ণ প্রতীক,
দ্যাখো, কোন্ ক্ষমাহীন যন্ত্রণায় বিকেলবেলার
নীল রৌদ্র মুছে নিয়ে সহসা উত্তাল দশদিক।
দশদিক অন্ধকার। শুধু হাওয়া, উন্মাদ, বিহ্বল,
উলঙ্গ উল্লাসে ব্যাপ্ত; সন্ধ্যার নিরালা দুই হাতে
টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ফেলে দিয়ে অসহ্য প্রবল
আক্রোশে বিক্ষুব্ধ মাথা রেখেছে রাত্রির জানালাতে।

রাত্রির জানলায় হাওয়া, অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার,
উত্তাল দশদিক জুড়ে ধ্বনিপুঞ্জে অমল যন্ত্রণা।
অদৃশ্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত হে বিষণ্ণ প্রতীক
এ-কার রক্তাক্ত মুখ জ্বলে ওঠে, এ-কোন্ অপার
নিষ্ঠুর নির্লজ্জ আলো, বিদ্যুতের দীপ্ত অগ্নিকণা?
স্মৃতি, চতুর্দিকে স্মৃতি, মুখ ঢাকো, নিঃসঙ্গ প্রেমিক।

রূপান্তর

সব-কিছু পুরনো লাগে, বন্ধুদের হাসি-গান-কথা,
ম্লান হয়ে আসে আলো হঠাৎ স্পন্দিত নগরীর,
থেমে যায় হাওয়া, গাছে পাতা-ঝরা, বিরল স্তব্ধতা
চক্ষুর সম্মুখে মেলে ধরে অন্ধকারের শরীর।
যেন বৃষ্টি হয়ে গেল এইমাত্র, যেন অবিরল
কুয়াশায় ঢেকে গেল পথের দু-পাশে পরিচিত
দৃশ্যপট, বাড়িঘর, গাছপালা, অস্থির-চপল
অন্তহীন জনস্রোত, যা-কিছু পুরনো, জীর্ণ, মৃত

এক মুহূর্তের জন্য বিরল স্তব্ধতা। অন্ধকার।
এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে অচেনা ঝরনার
তীব্র ছলচ্ছল, স্মৃতি, মন্দিরের চূড়া, উপবন,
জোনাকিপুঞ্জের নীল বিদ্যুতের তীক্ষ্ম বিচ্ছুরণ
মুছে নেয় বৃষ্টিপাত, অবিরল অস্পষ্ট কুয়াশা।
কেঁপে ওঠে শব্দ, ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, দ্যুতিময় ভাষা।

হলুদ বাড়িতে শোক

চেনা পথ ঝাপসা হয়ে আসে।
ধোঁয়া ও কুয়াশা ছিল লগ্ন হয়ে রাত্রির বাতাসে।
বিকেলে বৃষ্টির
অশ্রুর মতন ফোঁটা গ্যাসের আলোর গায়ে স্থির।
মেঘলা আঁধার ছিল মিশে
সরু গলিটির কোণে, ইতস্তত দেয়ালে-কার্নিসে।

সবাই ঘুমন্ত, সারা পাড়া, ঘর-বাড়ি,
ডাস্টবিন-ছুঁয়ে-থাকা কুকুর, ভিখারী।
আলো জ্বলে উঠে নিবে যায়
দূরের বাড়ির জানালায়।
আবছা আলোয়
ভিখারীটি পাশ ফিরে শোয়।
ঢেকে দিয়ে স্খলিত গুঞ্জন, চাপা কথা
ফের সূচীপতন স্তব্ধতা।

রাত ঘন হয়, রাত বাড়ে পৃথিবীতে,
পথ আর ফুরোয় না গলিটার হলুদ বাড়িতে।
সন্ধেরাতে কারা যেন এসেছিল, কারা গেছে চলে,
জ্বলন্ত স্মৃতির গন্ধ বেঁধে দিয়ে শোকার্ত আঁচলে।

গ্রন্থি

দু-দিকেই খুলে যায় অথবা যায় না কোনো দিকে,
তৃতীয় বিকল্প কিছু নেই।
সুতোর সামান্য টানে হেরফের হয়ে যায়।
হয় দেখা যায় তার মুখ
দর্পণে যেভাবে পড়ে অবিকল মুখের আদল,
না হলে পারদ
তুলে ধরে অন্ধকার, স্বচ্ছতার অনন্ত আড়াল।

তৃতীয় বিকল্প কিছু নেই।
সরাতে-সরাতে জল চিরকাল মাটি ও পাথর,
পারদের উলটো দিকে ছায়া।
সুতোর সামান্য টানে হেরফের হয়ে যায়।
দু-দিকে সমান পথ, জট খুলে যায়, আলো পড়ে,
না হলে পাথর-মাটি-পারদের গ্রন্থিল আঁধার
চিরকাল।

কলকাতা

ভালোবাসা কথাটির কোনো প্রতিধ্বনি নেই কলকাতা শহরে,
সমস্ত কলকাতা আজ মূক মিছিলের মতো ঘোরে
কালো ব্যাজ বুকে।
প্রকাশ্য রাস্তায়
প্রতিটি মানুষ হেঁটে যায়
নত মুখে;
অপমানে, লাঞ্ছনায় ম্লান
সমস্ত কলকাতা আজ ধূলিতে শয়ান।

কেউ তাকে দেখে, কেউ দেখে না; বিদ্রূপ
ছুঁড়ে দেয় কেউ, কেউ চুপ।
আমি শুধু তার
শিয়রের পাশে বসি, হাতে রাখি হাত শুশ্রূষার,
কোলে তুলে নিয়ে তার মাথা,
ওষ্ঠে চেপে ধরি দুই ঠোঁট।
চুপি চুপি বলি : তুই ওঠ,
এই অবেলায়
ভালোবাসা নিয়ে ফের মেতে ওঠ নতুন খেলায়
রাক্ষসী, প্রেয়সী কলকাতা।

প্রতিধ্বনি

একবার তুমি কথা বলে ওঠো
তৃষ্ণা আমার, বাসনা আমার,
ধ্বনিহীনতার স্রোতে জ্বলে ওঠো,
পুঞ্জ-পুঞ্জ শব্দের ভার।
স্তব্ধ কঠিন প্রান্তরভূমি
রূপান্তরের দীপ্ত জ্বালায়
দাউ-দাউ হয়ে জ্বলে যাক, তুমি
জাগো সেই নীল অগ্নিমালায়।

একবার তুমি জ্বলে ওঠো, কথা
বলে ওঠো, ধ্বনিবিহীন আলোতে
তমস্বিনীর সব নীরবতা
ভাঙুক অমোঘ শব্দের স্রোতে।
অস্থির দাহ শিরায়-শোণিতে,
তৃষ্ণা, বাসনা, যন্ত্রণাভার,
কথা বলে ওঠো শব্দে-ধ্বনিতে
নিয়তি আমার, নিয়তি আমার।

সম্রাজ্ঞীর সমীপে

বাইরে থেকে কতটুকু বোঝা যায়? যদি চাও তুমি
খুলে দেখাবো ছদ্মবেশ। সম্রাজ্ঞীর পদতলভূমি
চুম্বনে রঞ্জিত করে, নতজানু হবার ভঙ্গিতে
কাঁটার নীল মুকুট খুলে, অভিবাদন-সঙ্গীতে
মুখরিত সভাতলে একা শিল্পী লাঞ্ছিতগৌরব
ছদ্ম পোশাকের বর্ম একে-একে খুলে ফেলে সব
দেখাবে বুকের কোন্ গোপন সিন্দুকে জ্বলে তার
শেষ নক্ষত্রের মতো বাসনায় দীপ্ত অহঙ্কার।

অমরতা? দু-চোখের মণি ঋজু টর্চের মতন
হঠাৎ ঝলসে ওঠে। সংসারের নিতান্ত আগাছা,
অসুস্থ, মলিন, জীর্ণ, কোনোক্রমে বাঁচা কি না-বাঁচা;
তবু পোশাকের নিচে গোপন সিন্দুক, গুপ্তধন
বুকের ভিতরে জ্বলে শেষ নক্ষত্রের অহঙ্কারে।

লাঞ্ছিতগৌরব শিল্পী সম্রাজ্ঞী তোমার সভাদ্বারে।

একটি মৃত্যু

কী ছিল ওই বনের পারে
জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে
        ঘৃণার মতো, প্রেমের মতো, স্মৃতির মতো;
কী ছিল ওই অন্তহীন
নীলিমা ভরে রাত্রিদিন
        যা দিল তাকে ভুলিয়ে তার সকল ক্ষত।
কেন সে গেল, কিসের টান
জানাল তাকে এ-আহ্বান,
        দীর্ঘদেহ দেবদারুর স্তব্ধ ডাল
প্রেমিক হয়ে ডাকল তাকে
তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষাকে
        মেটাতে গিয়ে সে তাই আর ফেরে নি কাল।

আট টুকরো

১· অপ্রেম

যেন দুটি চক্ষু কেউ উপড়ে নিয়ে গেছে, সেই গভীর কোটরে
জ্বলে উঠছে ভয়ংকর বিশ্বাসহীনতা।
যেন জ্বালা অবিরাম শোণিতক্ষরণে, নষ্ট রক্তের ভিতরে
ঘাতকের ক্রূর নিষ্ঠুরতা।
যেন এক বিস্ফোরণ, যেন দুলে উঠছে ক্রুদ্ধ বাসুকির ফণা,
অন্তিম আক্রোশে জ্বলছে তীব্র অবিশ্বাস,
যেন দাহ, ক্ষতচিহ্ন, যেন সব জুড়ে—সব আকাঙ্ক্ষা-বাসনা
অপ্রেমের কঠিন নিঃশ্বাস।

২· কেন সারাদিন

ইচ্ছে হলেই ফুলের বাগান শব্দ করে ফুটে উঠবে!
হয় না, তুমি জেনে গেছ।
তুমুল অভিমানে বুকের ছিন্ন কুসুম আবার ফুটবে
ভেবেছিলে, হার মেনেছ।

তবে কেন সমস্ত দিন বুকের মধ্যে উথালপাথাল
মিথ্যে মাথা কোটাকুটি!
অচেনা কোন্ ধীবর এখন টেনে নিচ্ছে ছড়ানো জাল
দিনান্তে, তার শূন্য মুঠি।

৩· প্রীতিভাজনেষু

সিউড়ি থেকে উড়ে এল বাহাত্তর ঘণ্টা পরে কুশল সংলাপ:
তুমি কী রকম আছ? তুমি কী রকম আছ? কেমন এখন?
বন্ধুর উৎকণ্ঠা যেন সটান তর্জনী কিংবা সস্নেহ ভর্ৎসনা
যেন তীক্ষ্ণতম আলো নিদ্রাতুর চক্ষুর সম্মুখে—
চোখ জ্বলে ওঠে, স্পষ্ট যায় না তাকানো।
অস্বস্তি-যন্ত্রণা-অনুতাপবোধে সমস্ত শরীর-স্নায়ু-শিরা
গোঙানির মতো বলতে চায়:
ভালো নেই, ভালো নেই, কোনোদিন ছিলাম না ভালো।

৪· ছড়া

পুরু কাচের চশমা নাকে
বুদ্ধিজীবী-মাত্র,
নির্বাচিত বইয়ের তাকে
কামু-জয়েস-সার্ত্র।
সমস্ত দিন আড়াল রাখে
গুণগ্রাহীর দৃষ্টি
পিছন দিকে থাকে-থাকে
প্যারি ম্যাশন-ক্রিস্টি।

৫· নতুন প্লাসটিকে

নিতান্ত শিশুও আজ জেনে গেছে তার ভবিষ্যৎ,
জেনেছে যন্ত্রের নামে কী কাতর তীব্র অভিমানে
বয়স্ক পুতুল দুটি পরস্পর সন্দেহে প্রাথর।

এর নাম নিরাপত্তা। সুখী জীবনের নান্য পথ।
বর্বর নিয়তি তাই যতবার কাছে টেনে আনে
ততবার ভেঙে যায় অভ্যাসের আবেগের ঘর।

নতুন প্লাসটিকে ভরে ওঠে তার নিঃসঙ্গ জগৎ।

৬· কতটুকু পারি

দেব, দিতে পারি; হৃৎস্পন্দনের থেকে দ্রুততর
নিমেষে চারদিকে খুলে যায় যার সহস্র দরোজা
দ্বিধাহীন সেই সত্য। দেব, দিতে পারি, তীব্র, সোজা
উজ্জ্বল আলোর মতো স্বেদ-রক্তে অর্জিত প্রহরও।
দিতে পারি, দেব; কিন্তু কতটুকু সত্য পারি দিতে?
সত্য, যা ঝরনার মতো স্বচ্ছ অভিজ্ঞতাময় আলো,
মুহূর্ত-স্থপতি, তবু মুহূর্তের চেয়েও ধারালো?

পড়ে থাকে নষ্ট চাঁদ সারারাত নয়নজুলিতে।

৭· খেলা

তুমি পারো তুমি ইচ্ছে করলে পারো
একটি রুটিকে তিনভাগ করে দিতে,
তিনটি পিপাসু কণ্ঠের তৃষ্ণারও
শান্তির জল একটিই কলসীতে
রেখে দাও, তুমি অনায়াস উদাসীন।

এবং খণ্ড মেটায় না ক্ষুধা কারও,
তুমি জানো ; তবু ক্রূর কোন্ তৃপ্তিতে
ভুলে থাকো সেই ইচ্ছাগুলিকে গাঢ়—
যা কাঁপায় এই মাঘরজনীর শীতে
তোমারও সত্তা, ক্ষুরধার, ক্ষমাহীন।

৮· যাওয়া

গোপনে-গোপনে লাগে টান
শিকড়ে কোথাও, খুব ধীরে
বেজে ওঠে দূরের আজান
হঠাৎ শরীরে।

চলে যায়, যায়, যায়, যায়,
শরৎ-হেমন্ত-বর্ষা-শীত,
চতুর্দিকে কেবলই বিদায়,
কেঁপে ওঠে ভিত।

একদিন, কোনোদিন

যতদূর দেখা যায় হলুদের দু-পাশে হলুদ,
শাদা চৌখুপির পাশে শাদা,
বিবর্ণ লালের পাশে অবিকল বর্ণহীন লাল,
ধূসর শ্লেটের পাশে শ্লেট, তার পাশে ফের শ্লেট,
ফের শ্লেট...
সমান ধূসর।

সংকেতে চিহ্নিত বর্ণমালা।
এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট, ষোলো,
চব্বিশ-বত্রিশ,
পুরোবর্তী শ্রী যেন নামের
এ-বি-সি-ডি-ই-এফ অথবা
এক্স-ওয়াই-জেড।

যতদূর দেখা যায়, সাজানো রয়েছে সারিসারি
সমায়তনিক কিছু সামাজিক নকশার কোটর,
অর্থবহ মাপে-আঁটা বর্ণময় দরোজা-জানালা,
শাদার দু-পাশে শাদা, হলুদের দু-পাশে হলুদ,
বিবর্ণ লালের পাশে অবিকল বর্ণহীন লাল,
ধূসর শ্লেটের পাশে শ্লেট...

মানুষের স্থপতিকে তবু যেন ভেংচায় মানুষ।
একদিন, কোনো একদিন
ভেঙে দিয়ে সূক্ষ্মতম স্থাপত্য-শৃঙ্খলা
কেবলই ছাপিয়ে যায় অন্যতর মাত্রা-আয়তনে।
পড়ে থাকে জ্যোৎস্নায় ধূসর
লাল-শাদা-হলুদের সারিসারি অলীক খোলস।